সংবাদ

তারিখ 26 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটের বিড়ম্বনা

এম আর খায়রুল উমাম

মেয়েটা এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আশায় সংগ্রামরত। ভর্তির জন্য রাজধানীসহ সব জেলা শহরের যাঁতাকলে নিজে পিষ্ট হচ্ছে এবং অভিভাবককে পিষ্ট করছে। অভিভাবক হিসেবে আমাদের আশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করুক। সন্তান প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের ছাত্রী হবে। আনন্দ-উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকাটা খুব অন্যায় নয়। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন অলীক হয়ে যাবে? আগস্ট মাসে দেশব্যাপী সৃষ্ট তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ দমনে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখনও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ। ঈদ আর পূজার ছুটি কাটিয়ে অক্টোবরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা সেশনজটের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। নতুন করে এই উদ্বেগজনক পরিবেশের মধ্যে আমাদের যাওয়াটা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কিন্তু আমাদের কোন উপায় নেই। জেনেশুনে বিষপান করতে হবে। কারণ সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা একই। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই সন্তানের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আশা পূরণ করতে ঢাকা বা যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার সংগ্রামে শামিল হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত ছুটি ঘোষণার প্রথম ১৫ দিন বন্ধ থাকার ফলে বিভিন্ন অনুষদের ৮১৯টা পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দায়িত্ব শেষ করেছে আর খোলার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের ওপর দিয়ে নির্ভার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তারপরই খোলার কথা চিন্তা করেছে। সরকারের জন্য যে কাজটা সহজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য সেই নিরাপত্তার বিষয়টা তত সহজ নয়। বাংলাদেশের ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া যেখানে কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন আশায় আগ বাড়িয়ে দায়িত্ব নিতে যাবে? ছাত্র-শিক্ষকদের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটলে কৈফিয়ত দেবে কে আর দায়িত্বই বা কে নেবে? এই লেখা যখন শেষ করছি তখন জানা গেল, ২৮ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আগে ও পরে কাছাকাছি সময় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ বিপদে আছে এমনটা মনে হয় না। কেউ বিপদে থাকলে মানবিক কারণে উদ্ধারের প্রশ্ন আসে কিন্তু সেখানে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিপদে পড়তে হবে কেন? ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি? সুখে থাকলে ভূতে কিলোচ্ছে? কোন উদ্যোগ নিয়ে উপকার হবে এই অংক যতক্ষণ না মিলবে ততক্ষণ চুপচাপ থাকাই মঙ্গলজনক। সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে রাখা যাবে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। শোনা যায়, এ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ শিক্ষকের কর্মক্ষেত্র। এর সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকদের কোন সমস্যা নেই। তা যদি হয় তবে অসুবিধা কোথায় চুপ করে বসে থাকতে? সব ধরনের উপরি আয়ের পথ খোলা আর এখানে মাস গেলে বেতনও পাওয়া যায়। তাই মাঝে মধ্যে সামান্য নড়াচড়া দিয়ে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা দিলেই আমরা জানতে পারি ওনারা এখনও আমাদের মাঝে আছেন। আর এটা করা গেলেই কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডা।

মরাতে মরণ অভিভাবকদের। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জীবনের আলো নিভে যাওয়ার জোগাড়। দারিদ্র্যমুক্তির আশায় সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যে সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছে তার শেষ দেখা যাচ্ছে না।

সবাই পরস্পরের ওপর দোষারোপ করে নিজেকে ধোয়া তুলসি পাতা প্রমাণে ব্যস্ত। অভিভাবকরা আর যাবে কোথায়, কপালের ওপরে দোষ দেয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার এমন সুব্যবস্থা করা আছে যে একটা পরীক্ষার ফলাফল পেতে পরবর্তী পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে কোন কারণে একবার পরীক্ষা স্থগিত হলে আর রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে? মাত্র ১৫ দিনের ৮১৯ পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিন থেকে ছয় মাসের সেশন জটে পড়বে। পুরো বন্ধের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিবেচনা করতে গিয়ে মাথা গরম না করাই স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক।

আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দলীয় রাজনীতির আবেগ এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে অভিভাবকদের সবাই ভুলে যেতে বসেছে। দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সন্তানদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। এই অধম জনদের প্রতি নজর দেয়া খুবই জরুরি। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবাবদিহিতার বাইরে থাকতে পারে না। পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে অভিভাবকদের মুক্তির পথ দেখাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। একজন শিক্ষার্থীর জীবন থেকে এভাবে বছরের পরে বছর কেড়ে নেয়ার বিধান সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সবাই আশা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য দেশের এমন ক্ষতি মেনে না নিয়ে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট হবে। দরিদ্র অভিভাবকদের মুক্তির পথ দেখিয়ে দেশকে এগিয়ে যাওয়ার পথে নিবেদিত হবে। দেশে সেশনজটমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। সরকারের সামান্য আন্তরিকতা এটা সফল করবে।

২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের বাজেট ৬৮৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬২ জন। এবং ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ প্রতিদিন ১ কোটি ৮৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় একদিন বন্ধ থাকলে এই পরিমাণ টাকা জনগণের ক্ষতি হয়। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছর ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৬০ দিনের কার্য দিবস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ওপর যদি প্রায়শই অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধের মধ্যে পড়তে হয় তাহলে যে গভীর সঙ্কটে পড়তে হয় তা বলে শেষ করা যাবে না। বছরে ১০০ দিন জনগণ সহ্য করে, অন্যদিনগুলো সহ্য করতে কষ্ট হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে এমনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়তো পড়ত না কিন্তু নিজেদের দারিদ্র্য যে কোন আয়াস অপচয়কে ভাবতে বাধ্য করে। জনগণের অর্থ ব্যয় হবে বেফজুল তা মানতে কষ্ট হয় বৈকি। কর্তৃপক্ষকে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য ভাবতে হবে এবং সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার পরে কিছু বিদ্যালয়ের ওপর এবং এইচএসসি পরীক্ষার পর কিছু কলেজের ওপর সরকারি খড়গ নেমে আসে। পরীক্ষার ফলাফল খারাপ করা স্কুল-কলেজের তালিকা প্রকাশ করে তাদের এমপিওভুক্তি বাতিল করার কথা প্রচার করা হয়ে থাকে। জানি না বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটানো হয় কি-না? এটা সরকারি ধমক, না প্রকৃত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। দেশের সাধারণ মানুষ শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টিতে সরকারি ধমক নয়, স্বাভাবিক শাস্তি হিসেবে দেখতে চায়। এক গ্রুপ শিক্ষার্থীকে যদি দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহলে সবার ফলাফল একসঙ্গে খারাপ হতে পারে না। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ফলাফলের দায় গ্রহণ করতে বাধ্য। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এককভাবে কাউকে দায়ী করতে না চাইলেও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। বিদ্যালয় ও কলেজের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায় এড়াতে পারে না। তাদের অবর্ণনীয় সেশনজটের দায়িত্ব নিতে হবে। কর্তৃপক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে এই সমস্যা মূলত সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল-কলেজ যদি খারাপ ফলাফলের জন্য শাস্তিবহন করতে বাধ্য করা যেতে পারে তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কেন শাস্তি প্রদান করা যাবে না?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সামান্য আন্তরিক হলেই সেশনজট নিরসন করতে পারে। সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে সমস্যার সমাধান সহজতর হয়ে যাবে। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে সেশনজট নিরসনের একটা পরিকল্পনা নিতে বলে দেশের শিক্ষাবিদ দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বাস্তবায়ন করতে সরকার সাহায্য করবে। ২/১ বছরের আন্তরিক শ্রমে এই সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব। সেশনজট নিরসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থতায় শতকরা অংশ সরকারি বরাদ্দ থেকে কাটা যাবে। যতটুকু অংশ পালন করতে সক্ষম হবে শুধু সে পরিমাণ টাকা সরকারি অনুদান হিসেবে কর্তৃপক্ষ পাবে। ব্যর্থতার দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে। স্কুল-কলেজের মতো একেবারে এমপিও বাতিলের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে ধাপে ধাপে এগুলো যেতে পারে। যদি এই ব্যবস্থায় উন্নতি না হয় তাহলে পুরো সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়ার মতো শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এক দেশ এক নীতি হওয়াই উচিত। সবার জন্য আইনের সমান প্রয়োগ রাখা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান প্রশ্নের সম্মুখীন। ২০০৪ ও ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক মিশন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান ও কারিকুলাম নিয়ে নেতিবাচক ও হতাশাব্যঞ্জক প্রতিবেদন পেশ করে। বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আমরা নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বের অনেক দেশেই কম। তাই আর সরকারি অবহেলা নয়, শিক্ষার মান উন্নয়নে কঠোর আইনি ব্যবস্থা কাম্য।